Vol. 29 | No. 3 | 1986

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

কাগমারী সম্মেলন : ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি প্রসঙ্গ

Volume	29
Issue	3
Year	1986
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	Syed Mohammad Shahed
Published online	June 1, 1986
DOI	10.62328/sp.v29i3.5
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v29i3.5
Pages	130-158
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

কাগমারী সম্মেলন : ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি প্রসঙ্গ

সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ

বিশ শতকের মধ্যবর্তী চারটি দশক (১৯৪০---১৯৮০) বঙ্গ ও বাঙালীর জীবনে বারংবার মত ও পট পরিবর্তনের কাল। সহস্র বছরের ঐতিহ্য ও প্রজ্ঞাসম্পন্ন একটি জাতি এই সময়েই স্বীয় ভবিষ্যৎ নির্ধারণে বারংবার চরম অস্থির ও বিভ্রান্ত ভাব প্রকাশ করে। চল্লিশের দশকে বাঙালী জাতি উগ্র ও সাম্প্রদায়িক জাতীয়তাবাদের মোহে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। পঞ্চাশের দশকের গোড়া থেকে অবশ্য পূর্ব-বঙ্গে ভাষাভিত্তিক অসাম্প্রদায়িক জাতীয়তাবাদের জয়যাত্রা সূচিত হয়, যার পরিণতি ১৯৭১ সালে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা। ইতিহাসের এই বিকাশধারায় ১৯৫৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে অনুষ্ঠিত 'কাগমারী সম্মেলন' একটি মাইলস্টোনস্বরূপ।*

পটভূমি : এক

১৯৫৬ সালে পাকিস্তান গণপরিষদে যুক্তনির্বাচনের প্রথা গ্রহণ, এ-বছরের ৬ই সেপ্টেম্বর আতাউর রহমান খানকে মুখ্যমন্ত্রী করে পূর্ব পাকিস্তানে আওয়ামী লীগ মন্ত্রীসভা গঠন, ১২ই সেপ্টেম্বর হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীকে প্রধানমন্ত্রী করে পাকিস্তানে কেন্দ্রীয়ভাবে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে কোয়ালিশন সরকার গঠন, প্রভৃতি ঘটনার মধ্য দিয়ে পঞ্চাশের দশকের দ্বিতীয়ার্ধে পাকিস্তানে প্রথমবারের মত একটি গণতান্ত্রিক পরিবেশের সৃষ্টি হয়। কিন্তু বাগদাদ চুক্তিভুক্ত (পরবর্তী সময়ে সেন্টো নামে পরিচিত) সামরিক জোটে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্তির পক্ষে সোহ্‌রাওয়ার্দীর অনমনীয় মনোভাব আওয়ামী লীগ সভাপতি আবদুল হামিদ খান ভাসানীকে বিব্রত ও বিক্ষুব্ধ করে তোলে। দলের জাতীয়তাবাদী এবং বামপন্থী নেতা ও কর্মীরা পাকি-

স্তানের পররাষ্ট্রনীতির প্রশ্নে দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়লে আওয়ামী লীগ ভাঙনের পর্যায়ে এসে পৌঁছায়। আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠী এবং পাকিস্তানের প্রতিক্রিয়াশীল সামরিক-আমলাচক্র এই মতভেদের সুযোগ নিয়ে দলের উভয় গ্রুপকেই গোপনে বিভিন্নভাবে উস্কানি দান করে।[১] এই যুগসন্ধিকালে আবদুল হামিদ খান ভাসানী টাঙ্গাইলের কাগমারীতে আওয়ামী লীগের একটি বিশেষ কাউন্সিল অধিবেশন ও কর্মীসমাবেশ আহ্বান করেন। পাকিস্তানের পররাষ্ট্রনীতি, পূর্ব বাংলার স্বায়ত্বশাসন ও একুশ দফার বাস্তবায়ন—এই তিনটি ইস্যু সমাবেশের মুখ্য আলোচ্য বিষয়রূপে ঘোষিত হয়।[২] সমাবেশের আহ্বানে আরও বলা হয় :

> ৭ই ফেব্রুয়ারী হইতে কৃষি, শিল্প প্রদর্শনী ও সাংস্কৃতিক সম্মেলন। প্রদর্শনীর জন্য শ্রেষ্ঠ দ্রব্যসম্ভার আনয়নের এবং সাংস্কৃতিক সম্মেলনের জন্য শিল্পীগণকে অনুরোধ জানান যাইতেছে।[৩]

উল্লিখিত সাংস্কৃতিক সম্মেলনই বর্তমান নিবন্ধে আলোচ্য 'পাকিস্তান সাংস্কৃতিক সম্মেলন' সাধারণভাবে যা কাগমারী সাংস্কৃতিক সম্মেলন নামে পরিচিত।

পটভূমি : দুই

তবে কাগমারী সাংস্কৃতিক সম্মেলনের আর একটি ভিন্নতর পটভূমিও ছিল।

সাহিত্য কিংবা সাংস্কৃতিক সম্মেলনের আয়োজন অবিভক্ত বঙ্গের দীর্ঘকালের প্রচলিত রীতি।[৪] পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠার পরও পূর্ববঙ্গে এই রীতি অব্যাহত থাকে। ১৯৪৯ সালের জানুয়ারী মাসে ঢাকায় 'পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলন'; ১৯৫১ সালের মার্চ মাসে চট্টগ্রামে 'পাকিস্তান সাংস্কৃতিক সম্মেলন'; ১৯৫২ সালের আগস্ট মাসে কুমিল্লায় 'পূর্ব পাকিস্তান সাংস্কৃতিক সম্মেলন'; ১৯৫২ সালের অক্টোবর মাসে ঢাকায় 'ইসলামী সাংস্কৃতিক সম্মেলন'; ১৯৫৪ সালের এপ্রিল মাসে ঢাকায় 'পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলন' প্রভৃতি এ-প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়।[৫]

১৯৫৪ সালে অনুষ্ঠিত ঢাকার সাহিত্য সম্মেলনে তৎকালে পূর্ব পাকিস্তানে ক্ষমতাসীন যুক্তফ্রন্ট সরকারের সমর্থন ছিল। এই সম্মেলনের সংগঠকদের অধিকাংশই ছিলেন মানবতাবাদী, গণতন্ত্রী ও উদারপন্থী সাংস্কৃতিক কর্মী। সম্মেলনের সাফল্যে এ-সকল কর্মীরা স্বভাবতই অনুপ্রাণিত হন। তারা এ-ধরনের আরও নতুন সম্মেলন সংগঠনে উদগ্রীবও ছিলেন। ১৯৫৬ সালের ডিসেম্বর মাসে ঢাকায় তাদেরই কয়েকজনের সঙ্গে পুরাতন ঢাকার একটি বাড়ীতে মওলানা ভাসানীর সাক্ষাৎকার ঘটে। এই সাক্ষাৎকারে তিনি 'কাগমারীতে একটি বড় রকমের সাংস্কৃতিক সম্মেলনের আয়োজন' করার জন্য আহবান জানান।[৬] এর কয়েকদিনের মধ্যে কাগমারী সাংস্কৃতিক সম্মেলনের আয়োজনের জন্যে নিম্নোক্ত প্রস্তুতি কমিটি গঠিত হয়[৭] :

চেয়ারম্যান: আবদুল হামিদ খান ভাসানী ;
আহ্বায়ক: আবু জাফর শামসুদ্দীন;
যুগ্ম-কোষাধ্যক্ষ : সদ্‌রী ইস্পাহানী ও ইয়ার মোহাম্মদ খান;
সদস্য: কাজী মোহাম্মদ ইদরিস, ফকীর শাহাবুদ্দিন আহমদ, খায়রুল কবীর ও খন্দকার মোহাম্মদ ইলিয়াস।

প্রস্তুতি

কাগমারী সাংস্কৃতিক সম্মেলনের বিধিবদ্ধ নামকরণ করা হয় 'পাকিস্তান কালচারাল কনফারেন্স'। পুরাতন ঢাকার ৪৯ নবেন্দ্র বসাক লেনে এর প্রস্তুতি কমিটির দফতর স্থাপন করা হয়। যোগাযোগের জন্য দৈনিক ইত্তেহাদের গ্রাম (টেলিগ্রাফের জন্য) এবং টেলিফোন নম্বর ব্যবহার করা হয়।[৮] পরে তৎকালীন জিন্না এভিন্যুর (বর্তমান বঙ্গবন্ধু এ্যাভিন্যু) একটি বাড়ীর দোতলায় প্রস্তুতি কমিটির অফিস স্থানান্তরিত হয়।[৯]

১৯৫৭ সালের জানুয়ারী মাস থেকেই প্রস্তুতি কমিটি দেশ ও বিদেশের সাহিত্য-সংস্কৃতিসেবীদের নিকট আমন্ত্রণপত্র প্রেরণ শুরু করেন।[১০] পূর্ব পাকিস্তানের প্রায় এক সহস্র সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বকে এই সম্মেলনে যোগদানের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়। পশ্চিম পাকিস্তান থেকে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যসহ প্রায় অর্ধশত ব্যক্তিকেও

আমন্ত্রণ জানানো হয়। এঁদের তালিকা প্রস্তুত করা হয় রেডিও পাকিস্তানের মাধ্যমে। দূতাবাসের মাধ্যমে নিম্নোক্ত দেশের প্রখ্যাত সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বের নিকটও আমন্ত্রণপত্র পাঠানো হয়:

> মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ভারত, চীন, আফগানিস্তান, সউদী আরব, বার্মা, শ্রীলংকা, তুরস্ক, ইন্দোনেশিয়া, জাপান, ফ্রান্স, লেবানন ও ট্রান্স জর্দান।

উদ্যোক্তাগণ দেশ ও বিদেশে যোগাযোগের ভিত্তিতে সম্মেলনের উদ্বোধনী অধিবেশন, সাহিত্য-অধিবেশন ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের কর্মসূচী নির্ধারণ করেন। সম্মেলনের কয়েকদিন পূর্বে তাঁদের পক্ষ থেকে নিম্নোক্ত কর্মসূচীটি বিতরণ করা হয়:

> মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর উদ্যোগে
> পাকিস্তান সাংস্কৃতিক সম্মেলন।
>
> স্থান : কাগমারী, সন্তোষ,
> ৮ হইতে ১০ই ফেব্রুয়ারী।
>
> মূল সভাপতি: ড. কাজী মোতাহার হোসেন।
>
> কর্মসূচী---
>
> প্রবন্ধ পাঠ: আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন মনীষীবৃন্দের বিভিন্ন বিষয়ে প্রবন্ধ পাঠ।
>
> সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, কবিগান, জারীগান, ভাটিয়ালী, মারফতী, মুর্শিদী, বিচ্ছেদ, ধুয়া, গণসঙ্গীত, পল্লীগীতি, যন্ত্রসঙ্গীত ও নৃত্যানুষ্ঠান।
>
> অংশ গ্রহণ করিবেন: রমেশ শীল, তসের আলী, মোছলেম, রাম সিং, মজিদ মিঞা, সুখেন্দু চক্রবর্তী ও পূর্ব পাকিস্তানের অন্যান্য জেলার এবং পশ্চিম পাকিস্তানের লব্ধপ্রতিষ্ঠ শিল্পীবৃন্দ।[১১]

সন্তোষ তখন মওলানা ভাসানীর প্রায় স্থায়ী নিবাস। সম্মেলনের প্যান্ডেল, মাইক, অতিথিদের থাকার স্থান, খাবারের ব্যবস্থা প্রভৃতি

তাঁর উদ্যোগে স্থানীয়ভাবেই সম্পন্ন করা হয়।[১২] সম্মেলনে যোগদান করার জন্য ঢাকা থেকে বিশেষ বাস সার্ভিসেরও ব্যবস্থা করা হয়।[১৩]

কর্মসূচী

সন্তোষের রাজবাড়ীর নাটমন্দিরে আওয়ামী লীগের সমাবেশের উদ্বোধন করা হয় ৭ই ফেব্রুয়ারী।[১৪] পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার ও পূর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক সরকারের মন্ত্রীবর্গ এবং আওয়ামী লীগ নেতা ও কর্মীদের উপস্থিতিতে সন্তোষ তখন জনসমুদ্রে পরিণত হয়েছে। এর সঙ্গে ছিল কাগমারী কৃষি-শিল্প প্রদর্শনীর প্রায় অর্ধশত আকর্ষণীয় স্টল। এ ছাড়াও সন্তোষের রাজবাড়ীর একটি কক্ষে তৎকালীন আর্ট কলেজের (বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা ইনস্টিটিউট) ৩০ জন ছাত্র শিল্পী কামরুল হাসানের ব্যবস্থাপনায় একটি চিত্র-প্রদর্শনীর আয়োজন করেন। এ-সকল চিত্র এর পূর্বদিন কাগমারী এলাকায় বসবাসরত জনগণের দৈনন্দিন জীবন অবলম্বনে তাৎক্ষণিকভাবে অঙ্কিত হয়েছিল।

৮ই ফেব্রুয়ারী যখন কাগমারী সাংস্কৃতিক সম্মেলনের উদ্বোধন করা হয়, সন্তোষ তখন আনন্দমুখর। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিলম্বের ফলে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী সোহ্‌রাওয়ার্দীর পক্ষে এর উদ্বোধন সম্ভব হয়নি, তবে সম্মেলনে তিনি একটি বাণী প্রেরণ করেন। তাঁর পরিবর্তে সম্মেলনের উদ্বোধন করেন পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী আতাউর রহমান খান। উদ্বোধনী ভাষণে তিনি বলেন যে অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি না-হলে ঐতিহ্যসমৃদ্ধ এদেশের সাংস্কৃতিক নবজাগরণও হবে না।[১৫] দেশ ও বিদেশের অতিথিদের অভ্যর্থনা জানিয়ে মওলানা ভাসানী বলেন যে পাকিস্তানের বিভিন্ন অঞ্চলের জনগণের মধ্যে ঘনিষ্ঠতর সম্পর্ক স্থাপন ও পৃথিবীর অন্যান্য রাষ্ট্রের সঙ্গে সমঝোতা সৃষ্টি করাই এই সম্মেলনের উদ্দেশ্য।[১৬] উদ্বোধনী অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান অনুষদের ডীন ড. কাজী মোতাহার হোসেন। সভাপতির ভাষণে তিনি মন্তব্য করেন:

> ...বিভিন্ন দেশের সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে মূলতঃ কোনই পার্থক্য নেই। সাধারণভাবে যে পার্থক্য দেখা যায় তা হচ্ছে কৃত্রিম এবং দেশের সুধীজন চেষ্টা করলেই তা দূরীভূত হতে পারে।...[১৭]

উদ্বোধনী দিনে সন্ধ্যার সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে কুষ্টিয়ার সঙ্গীতদল লালন ফকীরের গান এবং ঢাকার মুল্লুক চাঁদের যাত্রার দল 'সৎমা' যাত্রা-ভিনয় পরিবেশন করে।[১৮] ভারতীয় প্রচার দফতরের সৌজন্যে এদিন কবি নজরুল ইসলামের জীবনভিত্তিক প্রামাণ্য চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয়। মার্কিন প্রচার দফতরের Hungary Fights For Freedom প্রদর্শনকালে কর্মীদের প্রতিবাদ ও বিক্ষোভের মুখে চলচ্চিত্রটির প্রদর্শনী বন্ধ করে দেওয়া হয়।

৯ই ফেব্রুয়ারী সকালের অধিবেশনেও কাজী মোতাহার হোসেন সভাপতিত্ব করেন। তাঁর অনুপস্থিতিতে অধ্যক্ষ ইব্রাহিম খাঁ কিছু সময় সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। অধিবেশনে নিম্নোক্তদের শুভেচ্ছাবাণী পাঠ করে শোনানো হয় :

> ভারতের বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব মূলক্ রাজ আনন্দ; বিশ্বভারতীর তৎকালীন উপাচার্য বিজ্ঞানী সত্যেন বসু; পাকিস্তানের খ্যাতনামা শিক্ষাবিদ ড. রাজিউদ্দিন সিদ্দিকী; পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. মিয়া আফজাল হোসেন; পাকিস্তান টাইমসের সম্পাদক ফয়েজ আহমেদ ফয়েজ; সোভিয়েত, চীন ও তুরস্কের রাষ্ট্রদূত।

এদিনের প্রাতকালীন অধিবেশনে মোট ছয়টি প্রবন্ধ উপস্থাপিত হয়। 'The Origin of the Principal Pakistani Languages' বা 'পাকিস্তানের ভাষা' বিষয়ে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্; 'বাংলা সাহিত্যে মুসলিম প্রভাব' বিষয়ে ড. মুহম্মদ এনামুল হক: 'Pashtu Language and Literature'বিষয়ে পশতু একাডেমীর পরিচালক মওলানা আবদুল কাদের; 'The Reknowned Historian of the 15th Century Muslim World-Ibne Hajar al Asqalani' বিষয়ে পাকিস্তানে মিশরীয় দূতাবাসের সংস্কৃতি বিষয়ক এট্যাশে (attache) ড. হাসান হাবাশ; 'Cultural Life of Great Britain' বিষয়ে ব্রিটিশ কাউন্সিলের আঞ্চলিক প্রতিনিধি এফ. এইচ. কাউসন এবং ঢাকায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংস্কৃতি বিষয়ক প্রতিনিধি ডেভিড গার্থ 'Cultural Life of USA' বিষয়ে প্রবন্ধ পাঠ করেন।

এই অধিবেশনেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরবর্তীকালের উপাচার্য ইতিহাসবিদ ড. মাহমুদ হোসেন 'The Concept of Islamic Culture' বিষয়ে প্রবন্ধ পাঠ করেন এবং ভারতের প্রখ্যাত সাহিত্যিক অধ্যাপক হুমায়ুন কবীর 'ভারতের সাংস্কৃতিক জীবন' বিষয়ে বক্তৃতা করেন। হুমায়ুন কবীর তাঁর বক্তৃতার এক পর্যায়ে বলেন:

> ...পাকিস্তান ও ভারতের সাংস্কৃতিক মূল এক। আজ যখন বিজ্ঞান বিভিন্ন জাতিকে ঘনিষ্ঠ বন্ধনে আবদ্ধ করছে তখন মানুষে মানুষে হানাহানি সম্পর্কে ভাবাও বিস্ময়কর।
> ...এই ধরনের সম্মেলন একে অন্যকে ঘনিষ্ঠভাবে জানতে সুযোগ দেয়।[১৯]

এদিন দুপুরে রংপুরের লাঠিয়াল দল লাঠিখেলা প্রদর্শন করে।

একই দিনের বিকেলের অধিবেশনে পূর্ব পাকিস্তানের জনশিক্ষা পরিচালক আবদুল হাকিম 'পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষা ব্যবস্থা'; শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজের অধ্যক্ষ ওসমান গণী 'পাকিস্তানে শিক্ষার মাধ্যম'; পেশোয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের তৎকালীন প্রধান অর্থনীতিবিদ ড. আখলাকুর রহমান 'Thoughts on the Financial Aspect of the Development of Agriculture in Pakistan'; ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরবর্তী সময়ের উপাচার্য ড. এম. ও. গণী 'বিকল্প খাদ্য উৎপাদনের সমস্যা ও পন্থা'; পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে শহীদ দার্শনিক গোবিন্দচন্দ্র দেব 'পূর্ব পাকিস্তানে বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব' এবং কানাডীয় প্রতিনিধি ড. চার্লস জে. এডামস 'Iqbal' বিষয়ে প্রবন্ধ পাঠ করেন।

সন্ধ্যায় দুটি মঞ্চে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়। একটি মঞ্চে রমেশ শীল সম্প্রদায়ের ছড়াগান ও কবিগান, তসর আলীর দলের জারীগান ও বিচারগান, ঢাকার কল্লোল গোষ্ঠীর গীতিবিচিত্রা, রেডিও পাকিস্তানের শিল্পীদের সঙ্গীত, চট্টগ্রাম কৃষ্টি কেন্দ্রের নবজীবনের গান, রংপুর দলের ভাওয়াইয়া, প্রভৃতি পরিবেশিত হয়। অন্য একটি মঞ্চে পশ্চিম পাকিস্তানী শিল্পীদের লোকনৃত্য, যুবলীগের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, সরকারের কৃষি তথ্য কেন্দ্রের একটি প্রামাণ্য চিত্র, ভারতীয় প্রচার

দফতরের 'পথের পাঁচালী', মার্কিন প্রচার দফতরের 'Cow Boy' এবং ফরিদপুরের কাঞ্চনযাত্রা দলের যাত্রা পরিবেশিত হয়। এই যাত্রা পরিবেশনের পূর্বে আবু জাফর শামসুদ্দীন সম্ভবত 'সংস্কৃতির রূপান্তরে যাত্রার ভূমিকা' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন।[২০]

১০ই ফেব্রুয়ারী প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যে প্রাতকালীন অধিবেশনে কয়েকটি প্রবন্ধ উপস্থাপিত হয়। এর মধ্যে ছিল জাপানী দূতাবাস প্রতিনিধির 'Cultural Life in Japan'; কৃষিবিদ ড. এম. হেদায়েতুল্লার 'উন্নত ধরনের কৃষির জন্য সরকারী সাহায্যের ব্যবহার'; অর্থনীতিবিদ ড. এম. এন. হুদার 'পূর্ব পাকিস্তানের ভূমি ব্যবস্থা'; পানিসম্পদ বিশেষজ্ঞ বি. এম. আব্বাসের 'পূর্ব পাকিস্তানের সেচ ব্যবস্থা ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ': চিকিৎসাবিদ শামসুদ্দিন আহমদের 'On Heart Diseases'; প্রখ্যাত চিকিৎসক এম. এন. নন্দীর 'পূর্ব পাকিস্তানের স্বাস্থ্যব্যবস্থা উন্নয়নে মেডিক্যাল এসোসিয়েশনের ভূমিকা'; তৎকালীন ই.পি.সি.এস. আর প্রধান ড. কুদরাত-ই-খোদার 'পূর্ব পাকিস্তানের রাসায়নিক শিল্পের ভবিষ্যৎ উন্নতি' এবং অধ্যাপিকা কুলসুম হুদার 'পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের সাংস্কৃতিক যোগাযোগ'। পাকিস্তানের বেগম জেবুন্নিসা হামিদুল্লাহর একটি প্রবন্ধও অধিবেশনে পাঠ করা হয়।

এদিনের দুপুরের অধিবেশন ছিল মূলত সাহিত্য-অধিবেশন। এতে 'আধুনিক বাংলা সাহিত্য', শীর্ষক একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ পাঠ করেন কথাসাহিত্যিক শওকত ওসমান। অধিবেশনে পাকিস্তানের জনপ্রিয় নৃত্যশিল্পী মাদাম আজৌরী 'Dance through the Ages' শীর্ষক একটি স্বল্পপরিসরের প্রবন্ধও উপস্থাপন করেন।

এই অধিবেশনের মূল আকর্ষণ ছিল ভারতীয় প্রতিনিধিদের বক্তৃতা। মনীষী কাজী আবদুল ওদুদ ; ঔপন্যাসিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রবোধকুমার সান্যাল, সুফিয়া ওয়াদিয়া ও রাধারাণী দেবী; অনুবাদক নরেন্দ্র দেব প্রমুখ এই অধিবেশনে সংক্ষিপ্ত ভাষণ দেন। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় তার অভিভাষণে বলেন:

> ...মাতৃভাষা ও সাহিত্যের জন্য রক্তদানের দৃষ্টান্ত ইতিহাসে বিরল। পূর্ব বাংলার মানুষ এই ইতিহাস সৃষ্টি করেছে।...

> প্রেম, অহিংসা ও সততার বাণী বুকে নিয়ে সংস্কৃতির মুক্তি-তীর্থে আমাদের দীর্ঘ যাত্রাপথ। এই স্বপ্নের রাজ্যে পৌঁছুতে পারলেই আমাদের সংস্কৃতিসাধনার সার্থকতা।...[২১]

প্রবোধকুমার সান্যাল বলেন:

> ...এই সার্থকতার ব্যাকুলতা, স্নেহ ও বন্ধুত্ব, মৈত্রী ও সখ্যের প্রতি অনুরোধে বাঙালী প্রাণের এতবড় আয়োজন আর কোথাও দেখি নাই। পূর্ব বাংলা আজ এক আশ্চর্য মিলনমোহনায় পরিণত হয়েছে। এখানে এসে এই মিলনমোহনারই পূতসলিলে অবগাহন করলাম।...[২২]

এ-দিনের অধিবেশনে করাচী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক এ. বি. এম. হালিম এবং বেগম শামসুন্নাহার মাহমুদও বক্তৃতা করেন। মওলানা ভাসানী সম্মেলনে একাধিকবার ভাষণ দেন।

শেষ দিনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মূল আকর্ষণ ছিল রমেশ শীল, ফণী বড়ুয়া ও রাইগোপাল দাসের নেতৃত্বে সারারাত ধরে কবিগান। গানের বিষয় ছিল 'কৃষক-জমিদার'।

ভাষা-সাহিত্যবিষয়ক প্রবন্ধ

কাগমারী সাংস্কৃতিক সম্মেলনে ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ে মোট পাঁচটি প্রবন্ধ উপস্থাপিত হয়। এগুলি হল:

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ: "The Origin of the Principal Pakistani Languages';

মুহম্মদ এনামুল হক: 'বাংলা সাহিত্যে মুসলিম প্রভাব';

আবদুল কাদের: Pashtu Language and Literature';

চার্লস জে. এডামস: 'Iqbal';

শওকত ওসমান: 'আধুনিক বাংলা সাহিত্য'।

উপর্যুক্ত তালিকায় দেখা যায় যে, পূর্ববঙ্গের প্রতিনিধিদের পক্ষ থেকে উপস্থাপিত প্রথম প্রবন্ধে ভাষা ও সাহিত্যের আদিরূপ বা প্রাচীন যুগ, দ্বিতীয় প্রবন্ধে বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগের একটি স্বল্পালোচিত দিক এবং তৃতীয় প্রবন্ধে বাংলা সাহিত্যের আধুনিক যুগ আলোচিত হয়েছে। আবদুল কাদেরের প্রবন্ধে পাকিস্তানের একটি প্রাচীন ভাষার সাহিত্য নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে। 'Iqbal' শীর্ষক প্রবন্ধে একজন প্রধান উর্দু কবিকে অনুধাবন করা যায় পাশ্চাত্য সমালোচকের দৃষ্টিতে।

ভাষার উদ্ভব ও বিকাশ নিয়ে মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র সাধনা দীর্ঘকালীন। এর ফসল গুণে ও পরিমাণে অতুলনীয়। স্কুলজীবন থেকেই ভাষা-তত্ত্বের প্রতি ছিল তাঁর আন্তরিক আকর্ষণ।[২৩] পরবর্তী সময়ে (১৯২৮ খ্রী.) প্যারিসে বাংলা ভাষার ধ্বনিতত্ত্বের (Les Sons du Bengalie) উপর গবেষণা করে তিনি Diplo. Phon. ডিগ্রী লাভ করেন।[২৪] এর বহু পূর্বে (১৯১৮ খ্রী.) তিনি বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকায় 'আমাদের ভাষা সমস্যা', প্রতিভায় (১৯২৪) 'বাংলা বানান সমস্যা', মুসলিম ভারতে (১৯২০) 'ভারতের সাধারণ ভাষা' প্রভৃতি প্রবন্ধ রচনা করেন।[২৫]

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র ভাষাবিষয়ক ভাবনার একটি বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে তিনি ভাষাতত্ত্বের পাণ্ডিত্যপূর্ণ গবেষণার পাশাপাশি সমাজে ভাষাবিষয়ক জটিলতাসমূহও অনুধাবনে প্রয়াসী ছিলেন। ফলে ভারত বিভক্ত হয়ে পাকিস্তান গঠন অনিবার্য হয়ে উঠলে মুহম্মদ শহীদুল্লাহ পাকিস্তানের ভাষাসমস্যা নিয়ে নিবন্ধ রচনা শুরু করেন। ১৯৪৭ সালে দৈনিক আজাদে প্রকাশিত 'পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা সমস্যা' কিংবা একই বছরে বগুড়ার "তকবীর"-এ প্রকাশিত 'পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষার ভাষা সমস্যা' প্রভৃতি এর ফল।[২৬] কাগমারী সাংস্কৃতিক সম্মেলনে উপস্থাপিত প্রবন্ধটিও একই ধারার।

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌ সর্বমোট সাতটি ভাষাকে পাকিস্তানের মূল ভাষারূপে বিবেচনা করতেন। এগুলি হল :

১. বাংলা. ২. উর্দু. ৩. পাঞ্জাবী. ৪. সিন্ধী. ৫. পশতু. ৬. বলোচী এবং ৭. ব্রাহুই।

বাংলা ভাষার উৎস সম্পর্কে মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র মতামত যুগান্তকারী। ইতঃপূর্বে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়সহ প্রায় সকল ভাষাবিদেরই সিদ্ধান্ত ছিল যে বাংলা ভাষা পূর্ব মাগধী উড়িয়া ও আসামী ভাষার সমগোত্রীয় এবং এই ভাষাত্রয় মাগধী প্রাকৃত থেকে উদ্ভূত। কিন্তু শহীদুল্লাহ্‌ পর্যাপ্ত যুক্তি প্রদর্শনপূর্বক দাবী করেন যে বাংলা ভাষা গৌড়ী প্রাকৃতের পরবর্তী ভাষা থেকে উদ্ভূত। শহীদুল্লাহ্‌ আরও মনে করতেন যে সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগেই বাংলা ভাষায় সাহিত্যচর্চা শুরু হয়। কাগমারী সম্মেলনে উপস্থাপিত নিবন্ধেও তিনি এ-সকল মত পুনর্ব্যক্ত করেন।

উর্দু ভাষাকে মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌ ভারতীয় উপমহাদেশের Lingua Franca রূপে বিবেচনা করতেন। তিনি মনে করতেন যে উদ্ভবের দিক থেকে বাংলা ও উর্দু উভয়েই একই ইন্দো-ইউরোপীয় মূল ভাষার আর্য শাখার পাক-ভারতীয় উপশাখা হতে ক্রমবিবর্তনের ফলে সৃষ্ট। তাঁর মতে, ভারতবর্ষে পাঠান রাজত্বকালে ভারতীয়দের সঙ্গে ইরানী, আফগানী ও তুর্কী সৈন্যদের মেলামেশার ফলে উর্দুর উৎপত্তি হয়। মূলে উর্দু ও হিন্দী উভয়ে এক হলেও বহু সংখ্যক পারসী, আরবী, পশতু ও তুর্কী শব্দের মিশ্রণে উর্দু একটি আন্তর্জাতিক ভাষায় পরিণত হয়েছে।

পশতু ভাষার উদ্ভব সম্পর্কে মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র মতামত খুব স্পষ্ট নয়। তাঁর মতে, পশতু প্রাচীন পারস্য ভাষার একটি শাখা। পাকিস্তানের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে প্রচলিত এই ভাষা শহীদুল্লাহ্‌র মতে পাক-ভারতীয় ভাষার সংমিশ্রণে বর্তমান রূপ লাভ করেছে। তিনি পশতু সাহিত্যের বিকাশকালকে ষোড়শ শতাব্দীতে স্থাপন করেছেন, যার সম্পর্কে সম্পূর্ণ বিপরীত তথ্য একই সম্মেলনের একই অধিবেশনে পঠিত আবদুল কাদেরের প্রবন্ধে উল্লেখিত হয়েছে।

বেলুচিস্তানের প্রধান ভাষা বলোচীও শহীদুল্লাহ্‌র মতে প্রাচীন পারস্য ভাষা হতে উদ্ভূত। তবে তাতে ভারতীয় ভাষাসমূহের কোন প্রভাব দৃষ্টিগোচর হয় না।

পাঞ্জাবী ভাষাকে মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌ উর্দুর একটি উপভাষার সমতুল্য বলে বিবেচনা করেন। তাঁর মতে এই ভাষা শ্রুতিকটু এবং পশ্চিম

পাঞ্জাবেই ব্যবহৃত হয়। মুসলমানদের জন্যে এই ভাষার অক্ষর উর্দু এবং শিখদের জন্য গুরমুখী।

শহীদুল্লাহ্‌র মতে সিন্ধী ভাষা অর্বাচীন প্রাকৃতের একটি পরবর্তী রূপ। সিন্ধু প্রদেশে ব্যবহৃত এই ভাষা মুসলমানরা আরবী বা ফার্সী অক্ষরে এবং হিন্দুরা লন্ডা বা দেবনাগরী অক্ষরে লিখে থাকেন।

সর্বশেষে মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ বেলুচিস্তানের দুই লক্ষ মানুষের ভাষা ব্রাহুই নিয়ে আলোচনা করেন। তাঁর মতে এই ভাষা দাক্ষিণাত্যের দ্রাবিড় ভাষাসমূহের সমশ্রেণীর। এই ভাষায় কোন লিখিত সাহিত্য নেই।

পাকিস্তানে ব্যবহৃত ভাষার উৎস সম্পর্কে মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র মতামতকে তাঁর ভাষায় নিম্নোক্ত ছকে সজ্জিত করা যায়:[২৭]

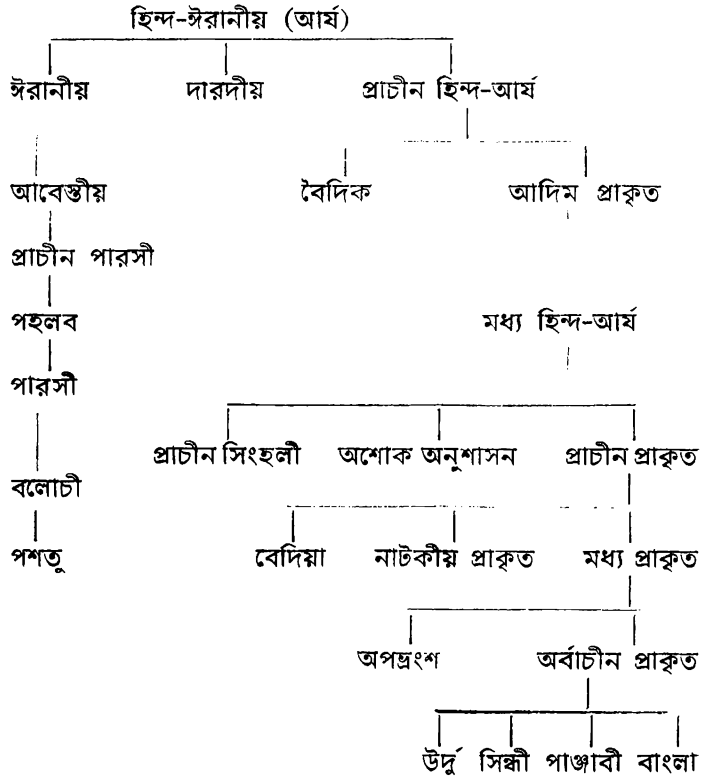

বস্তুতপক্ষে তৎকালীন পাকিস্তানে ব্যবহৃত ভাষাসমূহের উৎস-নির্ণয়ে এবং এ-সকল ভাষার মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক অনুধাবনে মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র পঠিত প্রবন্ধটি ছিল গুরুত্বপূর্ণ।

কাগমারী সাংস্কৃতিক সম্মেলনে উপস্থাপিত মুহম্মদ এনামুল হকের 'বাংলা সাহিত্যে মুসলিম প্রভাব' শীর্ষক নিবন্ধটি বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচনায় একটি নতুন দিকনির্দেশক। এর গুরুত্ব অনুধাবনের জন্য বাংলা সাহিত্যের ইতিপূর্বেকার ইতিহাসগ্রন্থসমূহের প্রতি দৃষ্টিপাত করা অপরিহার্য।

বাংলা সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য ইতিহাস রচিয়িতাদের মধ্যে দীনেশচন্দ্র সেন প্রাচীনতম। ১৯৪০ সালে তাঁর 'প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্যে মুসলমানদের অবদান' শীর্ষক একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়।[২৮] এই গ্রন্থ মূলত আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদের সংগৃহীত তথ্যের ওপর ভিত্তি করে রচিত। দীনেশচন্দ্র সেনের পর প্রায় সমজাতীয় বিষয় নিয়ে 'ইসলামী বাংলা সাহিত্য' নামক একটি গ্রন্থ প্রকাশ (১৯৫০) করেন সুকুমার সেন।[২৯] কিন্তু এই গ্রন্থদ্বয়ে বাংলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনার পূর্ণাঙ্গ চিত্র পাওয়া যায় না। স্মর্তব্য যে তখনও মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র 'বাংলা সাহিত্যের কথা', দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয়নি।

এই পটভূমিতে বিচার করলে কাগমারী সম্মেলনে মুহম্মদ এনামুল হকের প্রবন্ধটি ছিল যুগান্তকারী। উল্লেখ্য, এবছরেই তাঁর "মুসলিম বাংলা-সাহিত্য" গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়[৩০], যাকে সহজেই আমাদের আলোচিত প্রবন্ধের বিস্তৃতরূপ বলে বিবেচনা করা যেতে পারে। অনুমান করা যায়, পঞ্চাশের দশকের প্রথমার্ধেই এনামুল হক পূর্বোক্ত গ্রন্থটি রচনার কাজ শুরু করেন এবং এ-গ্রন্থের মূলভাব নিয়ে আলোচ্য প্রবন্ধটি প্রস্তুত করেন। প্রবন্ধটি এবছরেই 'মাহেনাও'-তে প্রকাশিত হয়[৩১] এবং বহু পরে 'মনীষা-মঞ্জুষা'-র প্রথম খণ্ডে সংকলিত হয়।[৩২]

আলোচ্য প্রবন্ধে মুহম্মদ এনামুল হক খ্রীস্টীয় নবম হতে দ্বাদশ শতাব্দীকে বাংলা ভাষার সৃজ্যমান যুগ এবং চর্যাপদকে 'বাংলা ভাষার সুস্পষ্ট লক্ষণাক্রান্ত প্রাকৃত অপভ্রংশে' রচিত বলে [বাংলা ভাষায় নয়] মত প্রকাশ করেন। তিনি নিঃসংশয়ে মনে করেন :

> ... ক্রম-বিলীয়মান ব্রাহ্মণ্য প্রভাব ও ক্রম-বর্ধমান মুসলিম প্রভাবের সুযোগ গ্রহণ করিয়া বাংলা ভাষা ধীরে ধীরে মাথা তুলিতে লাগিল।...বঙ্গে তুর্কী শাসনের প্রতিষ্ঠার পর দেশের সাংস্কৃতিক জীবনে যেই নতুন যুগের সূচনা হয়, তাহাতেই ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশের নবীন সম্ভাবনা দেখা দিয়াছিল।...

এই মত প্রকাশের মধ্য দিয়ে ড. হক দীর্ঘকালের প্রচলিত তুর্কী আক্রমণ-পরবর্তী সময়ে বাংলা সাহিত্যের 'অন্ধকার যুগ'-এর ধারণাকে রীতিমত চ্যালেঞ্জ প্রদান করেন। প্রকৃতপক্ষে তিনিই এই মতের প্রথম প্রতিবাদক।

"শূণ্যপূরাণের"-র অন্তর্গত 'নিরঞ্জনের রুষ্মা'য় বর্ণিত পরিবেশকে এনামুল হক আলোচ্য প্রবন্ধে 'ইসলামী পরিবেশ'রূপে চিহ্নিত করেন। তাঁর মতে, চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তন,' 'ইসলামী পরিবেশে' রচিত। তিনি মনে করেন যে চণ্ডীদাস একাধিক নন, একজন। প্রবন্ধে তিনি কৃষ্ণকীর্তনকে সুফীবাদের সঙ্গে নিম্নোক্তভাবে তুলনা করেন:

কৃষ্ণকীর্তন	সুফী-সাহিত্য
কৃষ্ণ	আশিক
রাধিকা	মাশুক
বড়াই	রাবিতা
বংশী খণ্ড বিরহ খণ্ড	দিল-আজারী জুদায়ী

এমন কি কৃষ্ণকীর্তনের 'বংশী খণ্ড'কে তিনি মৌলানা জালালুদ্দীন রূমীর (১২০৭-১২৭৩) 'বাঁশরী বেদন' কবিতার সঙ্গে তুলনা করে বলেন যে এই দুই কাব্যের মর্মাথ ও প্রতীক অবিকল এক, দেশভেদে কেবল ভাষাভেদ ও রূপভেদ ঘটেছে। তাঁর ভাষায়:

> ...প্রায় দেড় শতাধিক বৎসর ধরিয়া মুসলিম সংস্কৃতি ও সভ্যতা স্থায়ী ও বিস্তৃত হওয়ার ফলে চণ্ডীদাসের হাতে বাংলার প্রাচীন রাধা-কৃষ্ণ প্রেমলীলার লৌকিক কাহিনী এমনভাবে

মসলিম প্রভাবে প্রভাবিত হইয়াছিল। এই কাহিনীর লৌকিক ধারা পরবর্তী যুগে 'কৃষ্ণমঙ্গল' কাব্যে প্রাণধর্ম বিরল বর্ণনাত্মক পদ্যে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল এবং মুসলিম সুফীতত্ত্ব প্রভাবিত প্রাণধর্মী 'গজলিয়াৎ' জাতীয় গীতিধারা বৈষ্ণবদের 'পদাবলী সাহিত্যে' স্ফুর্ত ও মূর্ত হইয়া উঠিয়াছিল।...

ড. হকের এই মত তর্কের ঊর্ধ্বে নয় সত্য, কিন্তু এর মধ্যেও বাংলা সাহিত্যালোচনায় একটি নতুন দিক্‌নির্দেশ রয়েছে।

খ্রীস্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীর শেষার্ধ হতে ষোড়শ শতাব্দীর শেষপাদ পর্যন্ত কালকে মুহম্মদ এনামুল হক 'মুসলিম শাসনাধীনে বঙ্গে স্বাধীনতার যুগ' রূপে চিহ্নিত করেছিলেন। এই যুগে মুসলমান সুলতানদের পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলা-ভাষা ও সাহিত্যের 'অনন্যসাধারণ বিকাশ' ঘটেছে বলে তিনি দাবী করেন। নিবন্ধে তিনি নিম্নোক্ত উদাহরণ প্রদান করেন:

ক. গিয়াসউদ্দীন আজম শাহের রাজত্বকালে (১৩৮৯-১৪০৯) শাহ্ মোহাম্মদ সগীরের 'ইউসুফ-জুলেখা' এবং নুরুদ-দীন কুৎর-ই-আলমের 'রেখতা জাতীয় বাংলা গজল' রচনা;

খ. শামসুদ্দীন ইউসুফ শাহের রাজত্বকালে জৈনুদ্দীনের 'রসুল বিজয়' রচনা;

গ. নসরৎ শাহের রাজত্বকালে (১৫১৯-৩১) শেখ কবীরের পদাবলী রচনা।

ড. হক বৈষ্ণবদের মহাজন চরিতসমূহকে সুফীদের আউলিয়া-জীবনীর সমার্থক বলে মনে করেন। তিনি গজলিয়াৎ ও বৈষ্ণব পদাবলীকে এভাবে তুলনা করেন:

গজলিয়াৎ	পদাবলী
ইশ্‌ক	প্রেম
মৈয় ও শরাব	পিরীতি
সাকী	গোপিনী
সরাইখানা	বৃন্দাবন

অলোচ্য প্রবন্ধে মুগল যুগের বাংলা সাহিত্য রচনা সম্পর্কে ড. হকের মূল্যায়ন সম্পূর্ণ নেতিবাচক। তার মতে, এই সময়ে বাংলা সাহিত্যে নতুন কিছু সৃষ্টি হয় নি।

পাকিস্তান রাষ্ট্রের ২৪ বছরের স্থায়ীত্ব সত্ত্বেও পূর্ববঙ্গে একমাত্র উর্দু ছাড়া পাকিস্তানের অন্যান্য ভাষার সাহিত্য নিয়ে তেমন কোন আলোচনা হয়নি।[৩৩] সেদিক থেকে কাগমারী সম্মেলনে উপস্থাপিত মওলানা আবদুল কাদেরের "Pashtu Language and Literature" নিবন্ধটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই নিবন্ধটি ১৯৫৭ সালেই আল্লামা মহীউদ্‌দীন কর্তৃক অনূদিত হয়ে 'পশতু ভাষা ও সহিত্য' নামে 'মাহেনও' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।[৩৪]

নিবন্ধের শুরুতে আবদুল কাদের পশতু বা পাখতুনদের এশিয়া মাইনরের আদি আর্য জাতির একটি গোত্র বলে দাবী করেন। পশতু ভাষা সম্পর্কে তিনি বলেন:

> ...আর্যদের যে সব গোত্র [প্রচণ্ড শৈত্যের মধ্যেও] স্থান ত্যাগ করে নাই, তাহাদের ভাষা অবিমিশ্র রহিয়া গিয়াছে; উহাই আদি 'পশতু' ভাষা।...

তাঁর মতে পশতু কোনক্রমেই সেমেটিক ভাষা নয়, বরং ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার নিকটবর্তী। এই মতের সমর্থনে তিনি অধ্যাপক কেলিপর্থ, ডর্ণ, এলফিনস্টোন, রাওটি প্রমুখ ভাষাতত্ত্ববিদের যুক্তি উদ্ধৃত করেন।

নিবন্ধকার পশতু সাহিত্যকে অত্যন্ত প্রাচীন বলে বিবেচনা করেন, যদিও তার মতেও এর 'ইতিবৃত্ত আজও ঘোর অন্ধকারে নিমজ্জিত'। এরপর তিনি চার প্রকারের পশতু কবিতা সম্পর্কে আলোচনা করেন, যার সার-সংক্ষেপে নিম্নরূপ:

> **টীপা পদাবলী:** ...পদ দেড় লাইনে রচিত। ...ছন্দ সাদাসিধা। ...অনেক সময় Bank Verse ছন্দেও রচিত হয়। ...কবির নাম

অথবা ছদ্মনাম থাকে না। ...জীবনের ভাবনা, অনুভূতি, খেয়াল ও চিন্তাধারা পাওয়া যায়। ...পশতুতে অসংখ্য টিপা পদাবলী রয়েছে।...

চারবয়তী পদাবলী: ...এককালে চারটি মাত্র পংক্তিতে ইহা গঠিত হইত; তবে পরবর্তীকালে সম্ভবত ফার্সী কবিতার অনুকরণে ইহা পাঁচ হইতে ছয় লাইন...কলেবর লাভ করিয়াছে। এই সব পদের প্রত্যেক পংক্তিতে মিল থাকে।...ইহা খুব কমই লিখিত হয়।...সাধারণতঃ পল্লীকবিদের দ্বারা গীত হইয়া থাকে। ...ইহা চৌপদী ছন্দ বিশিষ্ট...। বাংলা চৌপদী পদাবলীর সঙ্গে ইহার সাদৃশ্য আছে। ...চৌপদী কবিতার মূল বিষয়বস্তু প্রেমিক প্রেমিকার ভাবের আদান-প্রদান।...

লুবা:...এ জাতীয় পদের নজীর দুনিয়ার অন্য কোথাও মিলে না। আঙ্গিকের দিক হইতে এইগুলি চৌপদী পদাবলীর ন্যায়...। প্রিয়তমের বিরহ-মিলন ইহার মূল আখ্যানবস্তু। ইহার আর এক রূপ আছে, তাহা নিমকীই নামে বিখ্যাত। প্রেমিক--প্রেমিকার মাঝে প্রশ্নোত্তর ধরনে এইগুলি রচিত...।

বদলাহ:...ইহা মসনভী বা ক্বাসীদাহ্ জাতীয় কবিতার ছন্দে গ্রথিত। অতীত কাহিনী, রামান্স, গল্প ইহার বিষয়বস্তু।

নিবন্ধে আবদুল কাদের পশতু সাহিত্যের ধারাবাহিক ইতিহাস সম্পর্কেও আলোকপাত করেন। তাঁর মতে, পশতু সাহিত্যের ঐতিহাসিক নিদর্শন মোহাম্মদ হোতক রচিত 'পূতখাজানা' বা 'অদৃশ্য সম্পদ'। এই গ্রন্থানুসারে পশতু কবিতার প্রাচীনতম উদাহরণ হিজরী দ্বিতীয় শতকের গোড়ার দিকে রচিত গৌর দেশের শাসনকর্তা আমীর ফোলাদ সুরীর পুত্র আমীর করোড় পহ্লওয়ানের কাব্য। নিবন্ধকারের মতে, এই কাব্যটি প্রাচ্যভাষায় রচিত সমুদয় কবিকীর্তির মধ্যে সর্বাপেক্ষা নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক উপাদান। সহস্র বৎসর পরও এর রূপ আদি ও অবিকৃত রয়েছে। এই কাব্যে ব্যবহৃত অধিকাংশ শব্দ বর্তমানে অব্যবহৃত বা স্বল্প-ব্যবহৃত।

আবদুল কাদেরের মতে, আমীর করোড়ের পরবর্তী প্রাচীন পশতু কবিগণ দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়েন। একদল প্রচলিত রক্ষণশীল ধারাকে অব্যাহত রেখে কাব্যচর্চা করেন, অন্যদল তাঁদের কবিতায় নিয়ে আসেন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বিভিন্ন সংস্কৃতির ভাবধারা ও সম্পদ। এই পর্যায়ে নিবন্ধকার হিজরী ২২৩-৯৩১ সালের মধ্যবর্তী ২০ জন পশতু কবির পরিচয় প্রদান করেন। কবিদের মধ্যে তিনি আবু হাশেমের (২২৩ হি:) কাব্যে আরবী-ফার্সীর প্রভাব; হিজরী ৬ষ্ঠ শতকে শেখ আসাদ লোধী রচিত পশতু ভাষায় প্রথম শোকগাথা এবং হিজরী ৭৫০ সালে রচিত আকবর জমিদাওরীর মসনভী সম্পর্কে বিশেষভাবে আলোকপাত করেন।

নিবন্ধকার পশতু সাহিত্যের দ্বিতীয় পর্যায়ের ১৫ জন কবি সম্পর্কেও আলোচনা করেন। এঁদের মধ্যে খোশহাল খান খাটক ও আবদুর রহমান বাবার কাব্যপ্রতিভার তিনি বিশেষ প্রশংসা করেন। তবে তিনি মনে করেন যে দ্বিতীয় পর্যায়ের পশতু কবিবৃন্দ মূলত 'পণ্ডিত ও আলেম'।

পশতু কাব্যে বহিরাগত সংস্কৃতির প্রভাব সম্পর্কেও নিবন্ধে যথাযথ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। দেখা যায় যে, হিজরী ১ম শতকে থেকেই পশতু কাব্যে পারস্য সংস্কৃতির; পরবর্তী সময়ে আরবীয় সংস্কৃতির; হিজরী ৬ষ্ঠ শতকে সুফী মতবাদের ও সর্বশেষে মোগল সংস্কৃতির প্রভাব বিস্তৃত হয়। তবে লেখকের মতে, 'মুগলদের আগমনের ফলে পশতু ভাষা ও সাহিত্যের রঙ ফিকা হইয়া গেল'।

পশতু ভাষায় গদ্য রচনা সম্পর্কেও আবদুল কাদের পাণ্ডিত্যপূর্ণ তথ্য উপস্থাপন করেন। তার মতে:

> ...এই সময়ে [হিজরী ৭৫০ সাল] পশতু ভাষায় 'নিম অরুয়া' অর্থাৎ আধা গদ্য জাতীয় কবিতার যুগ শুরু হয়।...
>
> [পশতু সাহিত্যে] সর্বাপেক্ষা প্রাচীন গদ্যের নমুনা 'তাজকিরাতুল আউলিয়া'য় পাওয়া যায়। ইহা সুলায়মান মাকু কর্তৃক ৬১২ হিজরী সালে লিপিবদ্ধ হইয়াছিল।'

নিবন্ধকারের পর্যবেক্ষণে ভারতে ব্রিটিশ শাসনামলে পশতু সাহিত্যে 'ভয়াবহ নীরবতা' লক্ষ্য করা যায়। তবে, বিংশ শতাব্দীর সূচনাকাল থেকে এর অবসান ঘটে এবং নবীন সাহিত্যকর্মীরা পাশ্চাত্য সংস্কৃতির সঙ্গে পশতু সাহিত্যের যোগাযোগ স্থাপন করে নতুন সৃষ্টিতে নতুন পথের সন্ধান দেন।

ড. চার্লস জে. এডামসের 'Iqbal' শীর্ষক নিবন্ধটি কোথাও মুদ্রিত হয়েছে বলে জানা যায় নি। পাকিস্তানের ইকবাল বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক মাসুদ-উল-হাসান দুইখণ্ডে ইকবালের যে প্রামাণ্য জীবনী তৈরী করেছেন, তাতে Ancedotes এবং Tributes শীর্ষক অধ্যায়দ্বয়ে বহু প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য মনীষীকৃত ইকবাল-মূল্যায়ন স্থান পেয়েছে।[৩৫] কিন্তু চার্লস এডামসের মূল্যায়নটি তাতে নেই।

শওকত ওসমান উপস্থাপিত 'আধুনিক বাংলা সাহিত্য' শীর্ষক প্রবন্ধটি মুদ্রিত কিংবা পাণ্ডুলিপি আকারে—এর কোনভাবেই এখন পর্যন্ত সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি।

সংস্কৃতি বিষয়ক প্রবন্ধ

কাগমারী সাংস্কৃতিক সম্মেলনে 'সংস্কৃতি' শব্দটিকে গ্রহণ এবং অনুশীলন করা হয়েছিল এর ব্যাপক সংজ্ঞার্থে। একটি জাতির সমগ্র বস্তুগত ও মানস-সম্পদ নিয়েই তার সংস্কৃতি। তাই অর্থনীতি, শিক্ষা, দর্শন, ইতিহাস, চিকিৎসাবিদ্যা, কৃষি, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার—সকল বিষয়েই এই সম্মেলনে আলোচনার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। কিন্তু বর্তমান নিবন্ধে আমরা সংস্কৃতিকে শুধু 'মানস-সম্পদ' অর্থে গ্রহণ করে এ-বিষয়ক আলোচনা করার পক্ষপাতী।

সীমাবদ্ধ সংজ্ঞার্থে বিবেচনা করলেও কাগমারী সম্মেলনে উপস্থাপিত সংস্কৃতিবিষয়ক নিবন্ধের সংখ্যা ছিল পাঁচটি। এগুলি হল:

মাহমুদ হোসেন : 'The Concept of Islamic Culture';
ডেভিড গার্থ : 'Cultural Life of USA';
এফ. এইচ. কাউসন: 'Cultural Life of Great Britain';

মাদাম আজৌরী : 'Dance Through the Ages';
জাপানী দূতাবাস : Cultural Life in Japan';
কুলসুম হুদা : 'পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের সাংস্কৃতিক যোগাযোগ।

এর সঙ্গে আবু জাফর শামসুদ্দীন উপস্থাপিত 'সংস্কৃতির রূপান্তরণে যাত্রার ভূমিকা' শীর্ষক প্রবন্ধ এবং অধ্যাপক হুমায়ুন কবীরের 'ভারতের সাংস্কৃতিক জীবন' বিষয়ক বক্তৃতাও যুক্ত করা যায়।

ডেভিড গার্থ তাঁর 'Cultural Life of USA'[৩৬] শীর্ষক নিবন্ধে আমেরিকার সাংস্কৃতিক জীবনের একটি বিস্তৃত চিত্র উপস্থিত করেন। আমেরিকার বর্তমান সাংস্কৃতিক পরিবেশ গঠনে তিনি রেড ইন্ডিয়ান, নিগ্রো প্রভৃতি গোষ্ঠীর অবদানের কথা উল্লেখ করেন। একজন পেশাদার ঔপন্যাসিক ও ছোটগল্পকার গার্থ আমেরিকায় শিল্পীর স্বীকৃতি ও মর্যাদা সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করে দাবী করেন যে তৎকালে আমেরিকায় শিল্পীরা 'নিতান্ত স্বাধীনভাবে তাঁর দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গীকে উন্নত ও সম্প্রসারিত পাটাতনে গড়ে তুলতে' পারেন।

ডেভিড গার্থ শিক্ষাকে সাংস্কৃতিক-জীবনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রূপে স্বীকার করে নেন। সেই সঙ্গে তিনি তৎকালীন আমেরিকার নাট্যচর্চা, সর্বজনীন গ্রন্থাগার, মুদ্রিত পুস্তকের বহু সংস্করণপ্রকাশ, ধ্রুপদী সঙ্গীতের প্রসার, ব্যালের জনপ্রিয়তা প্রভৃতি বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। তৎকালীন আমেরিকায় ভাব-সংস্কৃতির বিনিময়ের বাহন রূপে তিনি বেতার, চলচ্চিত্র ও টেলিভিশনের ভূমিকা সম্পর্কেও আলোকপাত করেন।

নিবন্ধের এক পর্যায়ে তিনি পৃথিবীর যুদ্ধজয়ের ইতিহাস পর্যালোচনা করে দেখান যে সামরিক শক্তির বলে অর্জিত বিজয় কখনো দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে না। ফলে তিনিও স্বীকার করেন:

> ...একটি জাতির সংস্কৃতি সে জাতির সামরিক শক্তি, তার বাস্তব সম্পদ ও ভৌগোলিক অবস্থানের চেয়ে অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ।...

আলোচ্য নিবন্ধে সংস্কৃতির সংজ্ঞা প্রদান করতে গিয়ে গার্থ বলেন:

> ...সংস্কৃতি এমন এক ভাবধারার সমন্বয়, যা নৈতিক, শৈক্ষিক ও আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে অভিব্যক্ত হয়। ...একটি জাতির সংস্কৃতি সে জাতির আধ্যাত্মিক শক্তিরই প্রতিকৃতি।...

এফ. এইচ. কাউসন 'Cultural Life of Great Britain'[৩৭] নিবন্ধে ব্রিটিশ সংস্কৃতির কয়েকটি উল্লেখযোগ্য দিক তুলে ধরেন। তিনি তৎকালীন ব্রিটেনে প্রতি ৩০ মিনিটে একটি নতুন বই প্রকাশ; করমুক্ত প্রকাশনা শিল্প; ব্রিটেনে যে কোন সময়েই শতকরা ৫৫ ভাগ মানুষেরই বই পড়া; অবৈতনিক বাধ্যতামূলক শিক্ষা; স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের সাহিত্য-সমাবেশ; হবি ক্লাব; শ্রমিকদের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড; ব্রিটেনে বিজ্ঞানের উৎকর্ষতা প্রভৃতি বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা উপস্থাপিত করেন।

নিবন্ধকার দাবী করেন যে ব্রিটেনে 'সংস্কৃতির উপর সরকারী নিয়ন্ত্রণ নাই'। বুর্জোয়া সংবাদপত্রসমূহের ক্ষতিকর প্রভাবের কথা অবশ্য কাউসন স্বীকার করেন। অন্যদিকে 'জনসাধারণের সংস্কৃতি বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই রুচি-বিগর্হিত'—এ ধরনের আপত্তিকর মন্তব্যও কাউসনের নিবন্ধে পাওয়া যায়। সংস্কৃতির প্রচারে গণমাধ্যমসমূহের নেতিবাচক প্রভাবের আশঙ্কাও তাঁর নিবন্ধে দৃষ্টিগোচর হয়। তবুও তিনিও স্বীকার করেন যে:

> ...যা কিছু উঁচুদরের সৃষ্টি, জনপ্রিয় সংস্কৃতির দ্বারা তার অবনতি ঘটে নি, বরং তা শক্তিশালী হয়েছে।...

তবে তা সত্ত্বেও নিবন্ধকার লক্ষ্য করেন যে, 'ব্রিটেনের সংস্কৃতি জন-সাধারণের ক্ষুদ্র একটি অংশের উপরই নির্ভরশীল।'

'Cultural Life in Japan'[৩৮] নিবন্ধের শুরুতে জাপানীদের উত্তর এশিয়া থেকে আগত জাতি হিসেবে পরিচয় দান করেও উল্লেখ করা হয় যে তাদের উপর পলিনেশীয় প্রভাব রয়েছে, যা জাপানীদের চৈনিক ও কোরীয়দের থেকে ভিন্নতা দান করেছে। নিবন্ধকার জাপানীদের জাতীয় চরিত্র নির্দেশ করতে গিয়ে তাদেরকে জাতীয় স্বাজাত্যাভিমানী, সৎ,

মিতাচারী এবং সৌন্দর্যপ্রিয় রূপে চিহ্নিত করেন। তবে তিনি স্বীকার করেন যে:

> ...জাপানী সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের উন্নততর দিকগুলির অধিকাংশই কোরীয় কিংবা চৈনিক উৎসের উত্তরাধিকার।...কিন্তু এই সকল সত্ত্বেও ভৌগোলিকভাবে জাপানের সংরক্ষিত অবস্থা কখনোই মহাদেশস্থ সংস্কৃতির ধারায় তাহাকে বিলীন হইয়া যাইতে দেয় নাই।...

জাপানীদের উপর পাশ্চাত্য প্রভাবের বিষয়টিও নিবন্ধে আলোচিত হয় এবং বিভিন্ন সংস্কৃতির আয়ত্তকরণের মধ্যেও জাপানীদের স্বকীয়তা অব্যাহত রাখাকে তাদের সভ্যতার প্রধান বৈশিষ্ট্য রূপে নির্ধারণ করা হয়।

আলোচ্য নিবন্ধের শেষ পর্যায়ে জাপানী সংস্কৃতির কয়েকটি উপাদান সম্পর্কে বিবরণ প্রদান করা হয়। এর মধ্যে রয়েছে সপ্তদশ শতাব্দীতে সেন-নো-রিকিউ উদ্ভাবিত 'চা নো ইউ' বা চা-পান উৎসব; ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে প্রচলিত পুষ্পসজ্জা যা ক্রমশ বৌদ্ধবেদী সজ্জা থেকে 'টোকোনোমা' সজ্জায় রূপান্তরিত হয়েছে এবং 'কাবুকি' ও 'নৃহ' নাট্যাভিনয়ের বর্ণনা।

সম্মেলনে উপস্থাপিত 'Dance Through the Ages'[৩৯] নিবন্ধটি ছিল সংক্ষিপ্ত অথচ সুগ্রথিত। জনপ্রিয় নৃত্যশিল্পী মাদাম আজৌরী আলোচ্য নিবন্ধে নিম্নোক্ত তথ্যসমূহ উপস্থাপন করেন:

১. আদিম মানুষ নৃত্যের মাধ্যমে তাদের অনুভূতি প্রকাশ করত;

২. প্রাচীন মিশরীয় সভ্যতায় নৃত্য ধর্মচর্চার অংশ ছিল;

৩. বাইবেলে নৃত্যের প্রশংসাসূচক উল্লেখ রয়েছে;

৪. প্রাচীন গ্রীসে নৃত্যকলার চর্চা বাধ্যতামূলক ছিল; প্লেটোর আদর্শ রাষ্ট্রের পরিকল্পনায়ও (Republic) নৃত্যের স্থান ছিল;

৫. 'প্রাচীন রোমে নৃত্য সৌন্দর্যচর্চার অঙ্গরূপে পরিগণিত হত;

৬. কিন্তু পরবর্তী সময়ে রোমেই নৃত্যে যৌন-আবেদন যুক্ত হয় এবং তা নেতিবাচকভাবে মনোরঞ্জনে ব্যবহৃত হয়;

৭. এভাবে নৃত্য সুকুমার কলা থেকে অপসৃত হয়, যদিও তা দ্রুত সমগ্র ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে;

৮. আধুনিক যুগে এসে ব্যালে, অপেরা প্রভৃতির মাধ্যমে নৃত্য তার পূর্বাসন ফিরে পায়।

আবু জাফর শামসুদ্দীন তাঁর 'সংস্কৃতির রূপান্তরণে যাত্রার ভূমিকা' শীর্ষক নিবন্ধে যাত্রার উৎস নির্দেশ করতে গিয়ে বলেন যে সংস্কৃত নাটক হতে যাত্রার উদ্ভব হয় নি, যাত্রা লোক-সংস্কৃতি-উদ্ভূত। যাত্রায় শুরুতে পৌরাণিক কাহিনীর ব্যবহার, আদি রসের আধিক্য, এর যাত্রা-গান হতে যাত্রাভিনয়ে রূপান্তর, যাত্রার উপর বিদেশী অপেরা ও ব্যালের প্রভাব প্রভৃতি বিষয়েও নিবন্ধে আলোকপাত করা হয়। নিবন্ধকার যাত্রাকে বিলুপ্তি থেকে রক্ষার জন্য এর বিষয়বস্তুতে যুগমানস ও যুগচেতনার প্রতিফলন ঘটানোর আবেদন জানান।

[অধিবেশনে উপস্থাপিত সংস্কৃতি-বিষয়ক বাকী দুটি নিবন্ধ এখন পর্যন্ত সংগ্রহ করা যায় নি।]

সম্মেলনে উপস্থাপিত আরও দুটি নিবন্ধের সঙ্গে সংস্কৃতি-বিষয়ক আলোচনার ঘনিষ্ট সংযোগ রয়েছে। এর একটি ড. হাসান হাবাশের 'The Reknowned Historian of the 15th Century Muslim World-Ibne Hajar Al Asqalani'[৪০]। আলোচ্য নিবন্ধে ড. হাবাশ চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতকের প্রখ্যাত মিশরীয় ঐতিহাসিক ইবনে হজরের জীবন ও ইতিহাসসাধনার একটি মূল্যায়ন উপস্থিত করেন। হজরের ইতিহাস গ্রন্থের মধ্যে জীবনীমূলক, রাজনৈতিক ও সামাজিক ইতিহাস ছিল উল্লেখযোগ্য। ড. হাবাশ এই নিবন্ধে ৭৭৩-৮৫০ হিজরী সাল সময়ের ঘটনাবলী নিয়ে রচিত 'IBNA'-র গুরুত্ব তুলে ধরেন। নিবন্ধে ইবনে হজরের শিক্ষকতা জীবনে ঐতিহ্য সচেতনতা, কাজী হিসেবে বিচারের

রায় দানে প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গী প্রভৃতি বিষয়েও আলোকপাত করা হয়।

দর্শনের অধ্যাপক ড, গোবিন্দচন্দ্র দেবের 'পূর্ব পাকিস্তানে বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব' শীর্ষক নিবন্ধটিতেও তৎকালীন পূর্বপাকিস্তানের অধিবাসীদের জনজীবনে গৌতম বুদ্ধের আদর্শ ও বৌদ্ধধর্মের প্রভাব সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়। বস্তুতপক্ষে বুদ্ধের জীবন ও বাণী গোবিন্দ দেবের প্রায় সারা জীবনের গবেষণার বিষয়বস্তু ছিল। চল্লিশের দশকে রচিত তাঁর পি. এইচডি. অভিসন্দর্ভ 'Idealism and Progress', পঞ্চাশের দশকে রচিত গ্রন্থ 'Idealism : A New Defence and a New Application' এবং ষাটের দশকে রচিত গ্রন্থ 'তত্ত্ববিদ্যাসার' -এ বুদ্ধ, বৌদ্ধধর্ম, বুদ্ধের বাণী ও পথ, বৌদ্ধ বিজ্ঞানবাদ, বৌদ্ধ ক্ষণিকবাদ প্রভৃতি বিষয়ে উল্লেখযোগ্য আলোচনা রয়েছে।[৪১] এরই সমন্বিত প্রকাশ দেখা যায় ড. দেবের ১৯৬৬-৬৭ সালে সুদূর প্যানসিলভানিয়ায় অবস্থানকালে রচিত 'Buddha, The Humanist'[৪২] গ্রন্থে। গোবিন্দ দেবের বিশ্লেষণে 'বুদ্ধের জীবন, বিবেক ও বৈরাগ্য-অনুভূতির এক ঐতিহাসিক উদাহরণ' এবং তিনি দৃঢ়ভাবে মনে করতেন যে :

> ...in Buddha, modernized and interpreted in the light of basic modern temper and needs, lies a great clue to the solution of our puzzle, a way out of our predicament....[৪৩]

কাগমারী সম্মেলনে উপস্থাপিত নিবন্ধেও এ-সকল মতের আলোকেই পূর্ব পাকিস্তানে বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব বিবেচনা করা হয়।[৪৪]

উপসংহার

পূর্বেই উল্লেখিত হয়েছে যে, কাগমারী সাংস্কৃতিক সম্মেলনে 'সংস্কৃতি'র সংজ্ঞার্থকে গ্রহণ ও অনুশীলন করা হয়েছিল এর ব্যাপকতর অর্থেই। বস্তুতপক্ষে তৎকালীন পরিবেশে এটিই ছিল পাকিস্তানে অনুষ্ঠিত

আন্তর্জাতিক মানের প্রথম সাংস্কৃতিক সম্মেলন। পশ্চিম পাকিস্তানের প্রতিনিধি দল ছাড়াও এই সম্মেলনে ছয়টি বিদেশী প্রতিনিধিদল যোগদান করে। পূর্ব বঙ্গ থেকে অংশগ্রহণকারীরাও ছিলেন নিজ নিজ ক্ষেত্রে বিশিষ্ট। প্রায় দুই লক্ষ গ্রামবাসীর যোগদান সম্মেলনকে একটি গণচারিত্রও দান করে।

একটি বিশেষ রাজনৈতিক কর্মীসমাবেশের পাশাপাশি অনুষ্ঠিত হলেও কাগমারী সাংস্কৃতিক সম্মেলনের কোন দলীয় চরিত্র ছিল না। এতে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে প্রগতিবাদী সাহিত্য-সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বের সঙ্গে মধ্যপন্থী ও রক্ষণশীলরাও ছিলেন। পঠিত প্রবন্ধসমূহের বিষয়-বস্তুও ছিল যে কোন বিচারেই সংকীর্ণতা-বিবর্জিত। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর ক্ষেত্রেও একই বিশ্লেষণ প্রযোজ্য।

কিন্তু এ-ধরনের উদার দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ সত্ত্বেও তৎকালীন 'পাক-বাঙলার সাহিত্য-তমুদ্দুন'-এর সেবকরা কাগমারী সাংস্কৃতিক সম্মেলনকে 'তথাকথিত সাংস্কৃতিক সম্মেলন' হিসেবে রূপায়িত করে।[৪৫] তাদের মুখপত্রসমূহে দীর্ঘসময় ধরে এই সম্মেলন সম্পর্কে অপপ্রচার চালানো হয়।

এ-সকল নেতিবাচক বিতর্ক সত্ত্বেও কাগমারী সম্মেলন সাহিত্য-সংস্কৃতি সেবকদের নিকট একটি সার্থক সম্মেলন রূপেই বিবেচিত হয়। পূর্ববঙ্গের সাহিত্যচর্চায় পরবর্তী যুগে যে বস্তুনিষ্ঠ সৃষ্টি এবং সমালোচনার ধারা বেগবান হয়, তাতে কাগমারী সাংস্কৃতিক সম্মেলনের প্রভাব অনস্বীকার্য।

উৎস ও তথ্যনির্দেশ

* বর্তমান নিবন্ধে কাগমারী সাংস্কৃতিক সম্মেলনের অনেকগুলি মূল দলিল এবং সম্মেলনে উপস্থাপিত প্রবন্ধের পাণ্ডুলিপি উৎসরূপে ব্যবহার করা হয়েছে। এক্ষেত্রে পৃথকভাবে বার বার সূত্র-নির্দেশ করা হয়নি। এ-সকল দলিল ও প্রবন্ধের পাণ্ডুলিপি সম্মেলনের আহ্বায়ক আবু জাফর শামসুদ্দীনের সৌজন্যে ব্যবহার হয়েছে। তাঁর সহৃদয় সহায়তার জন্য বর্তমান নিবন্ধকার কৃতজ্ঞ।

১ এ-বিষয়ে বিস্তৃত বিবরণ রয়েছে সে-সময়কার পত্র-পত্রিকায়; কমরুদ্দিন আহমদ ও আবু জাফর শামসুদ্দীনের সামাজিক রচনাসমূহে এবং আবুল মনসুর আহমদ ও আতাউর রহমান খানের স্মৃতিমূলক রচনাসমূহে।

২ মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী কর্তৃক প্রচারিত (মুদ্রণ: ১৩ জানুয়ারী, ১৯৫৭) একটি লিফলেটে এর বিস্তৃত বিবরণ রয়েছে। দ্রষ্টব্য: হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পাদিত)। "বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ: দলিলপত্র", ১ম খণ্ড। তথ্য মন্ত্রণালয়, ঢাকা। সেপ্টেম্বর, ১৯৮২। পৃ. ৫৯১

৩ দ্রঃ পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৯১

৪ বঙ্গে সাহিত্য-সাংস্কৃতিক মেলা ও সমাবেশের ঐতিহ্য সুপ্রাচীন। এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ প্রভৃতির প্রতিষ্ঠার পর বিংশ শতাব্দীতে সাহিত্য-সাংস্কৃতিক সমাবেশে নবজীবন দেখা দেয়। পূর্ববঙ্গও এ-ধারায় ষাটের দশক পর্যন্ত পিছিয়ে ছিল না।

৫ বিবরণ ও সূত্রের জন্য দ্রঃ

রফিকুল ইসলাম। "বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম"। নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা। মার্চ, ১৯৮১। পৃ. ৪৩-৭৯ এবং সাঈদ-উর-রহমান। "পূর্ব বাংলার সাংস্কৃতিক আন্দোলন"। ডানা প্রকাশনী, ঢাকা। জানুয়ারী, ১৯৮৩। পৃ. ১৭-৩২

৬ আবু জাফর শামসুদ্দীন। 'কাগমারী সাংস্কৃতিক সম্মেলন ১৯৫৭, সমৃতিচারণ', "সংবাদ"। ৭ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৮২

৭ পূর্বোক্ত।

৮ দ্রঃ 'পাকিস্তান কালচারাল কনফারেন্স' শিরোনামকৃত মুদ্রিত প্যাড।

৯ আবু জাফর শামসুদ্দীন। 'কাগমারী সাংস্কৃতিক সম্মেলন ১৯৫৭: স্মৃতিচারণ'।

১০ এই অনুচ্ছেদের তথ্যের জন্য দ্রঃ
"সংবাদ"। ১৮ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৭ তারিখে প্রকাশিত আবু জাফর শামসুদ্দীনের একটি বিবৃতি।

১১ দ্রঃ আবু জাফর শামসুদ্দীন। 'কাগমারী সাংস্কৃতিক সম্মেলন ১৯৫৭: স্মৃতিচারণ'।

১২ পূর্বোক্ত।

১৩ "ইত্তেফাক"। ৬ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৭

১৪ এই অনুচ্ছেদের তথ্যের জন্য দ্রঃ
"সংবাদ"। ৭, ৮ ও ৯ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৭

১৫ দ্রঃ "সংবাদ"। ৯ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৭

১৬ পূর্বোক্ত।

১৭ পূর্বোক্ত।

১৮ এই অনুচ্ছেদের তথ্যের জন্য দ্রঃ পূর্বোক্ত

১৯ দ্রঃ "সংবাদ"। ১০ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৭

২০ প্রবন্ধটি সম্মেলনের পঠিত প্রবন্ধসমূহের সঙ্গেই সংরক্ষিত অবস্থায় পাওয়া গেছে। কিন্তু এর উপস্থাপনের সময় সম্পর্কে প্রবন্ধকার নিঃসংশয় নন।

২১ দ্রঃ "সংবাদ"। ১১ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৭

২২ পূর্বোক্ত।

২৩ এর একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ স্কুলে থাকাকালীন সংস্কৃত, গ্রীক, লাতিন, পারসী, বাংলা ও তামিল ভাষায় Imperative Mood-এর চার্ট তৈরীর প্রচেষ্টা।

দ্রঃ মুহম্মদ সফিউল্লাহ (সম্পাদিত)। "শহীদুল্লাহ্ সংবর্ধনা গ্রন্থ"। রেনেসাঁস প্রিন্টার্স, ঢাকা। মার্চ, ১৯৬৭। পৃ. ৫৬৩

২৪ দ্রঃ পূর্বোক্ত। পরিশিষ্ট পৃ. ২৫

২৫ দ্রঃ সূচীপত্র। মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্। "ভাষা ও সাহিত্য"। ঢাকা লাইব্রেরী, ঢাকা। ১৯৩১

২৬ দ্রঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্। "আমাদের সমস্যা"। রেনেসাঁস প্রিন্টার্স, ঢাকা। ১৯৪৯

২৭ ছকটি প্রস্তুত করা হয়েছে মুহম্মদ শহীদুল্লাহর ব্যবহৃত ছক অনুসরণে। ব্রহুই দ্রাবিড় ভাষা হওয়াতে তা এই ছকে দেখানো যায় নি।

২৮ দীনেশচন্দ্র সেন। "প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে মুসলমানদের অবদান" ১৯৪০

২৯ সুকুমার সেন। "ইসলামী বাংলা সাহিত্য"। বর্ধমান সাহিত্য-সভা, পশ্চিম বঙ্গ। ১৯৫৫

৩০ দ্র: মুহম্মদ এনামুল হক। "মুসলিম বাংলা-সাহিত্য"। পাকিস্তান পাবলিকেশন্স, ঢাকা। ১৯৫৭

৩১ দ্র: "মাহেনও"। ৫ম বর্ষ, ৩২শ সংখ্যা, পৃ. ৩৫-৪১

৩২ দ্র: মুহম্মদ এনামুল হক। "মনীষা-মঞ্জুষা", ১ম খণ্ড। মুক্তধারা, ঢাকা। ১৯৭৫

৩৩ পাকিস্তানী আমলে পাকিস্তানের আঞ্চলিক ভাষাসমূহ নিয়ে পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনার অভাব ছিল প্রকট। রাজনৈতিক কারণে পশ্চিম পাকিস্তানের ভাষা নিয়ে পূর্ববঙ্গে তেমন কোন আলোচনাও হয়নি। মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র কয়েকটি আলোচনাই ছিল এ-বিষয়ে উজ্জ্বল ব্যতিক্রম।

৩৪ দ্র: "মাহেনও"। ৯ম বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা; পৃ. ৪৯-৫২ এবং ৯ম বর্ষ, ৭ম সংখ্যা। পৃ. ৪৬-৪৯

৩৫ See. Masud-ul-Hasan. "Life of Iqbal", Book I and II. Feroz sons Ltd. Lahore.

৩৬ নিবন্ধটির বঙ্গানুবাদ ২৪শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৭ তারিখে ঢাকার দৈনিক "মিল্লাত"-এ প্রকাশিত হয়।

৩৭ নিবন্ধটির বঙ্গানুবাদ করেন বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে মর্মান্তিক-ভাবে নিহত সাংবাদিক-সাহিত্যিক শহীদ সাবের। অনুবাদটি কোথাও প্রকাশিত হয়নি।

৩৮ সম্মেলনের সংগঠকরাই এই নিবন্ধটি অনুবাদের ব্যবস্থা করেন। অনুবাদক অজ্ঞাত।

৩৯ এই নিবন্ধটির কোন বাংলা অনুবাদ পাওয়া যায়নি।

৪০ এই নিবন্ধটিরও কোন বাংলা অনুবাদ সংরক্ষিত কাগজপত্রের মধ্যে পাওয়া যায় নি।

৪১ See. Hasan Azizul Huq (ed). "Works of Govinda Chandra Dev", Vol. I. Bangla Academy, Dhaka. 1977, pp. 235, 247, 272, 358, 363. 373, 374-75, 377, 409, 448, 454-56, 466, 527, 548.

এবং হাসান আজিজুল হক (সম্পাদিত)। 'গোবিন্দচন্দ্র দেব রচনাবলী", ৩য় খণ্ড। বাংলা একাডেমী, ঢাকা। ১৯৭৯। পৃ. ১০২, ১১৭, ১৬৬, ১৭৯, ১৯১, ২৩০৯, ২৫৬-৫৮, ২৮৪, ৩২৪, ৩৫৬

৪২ G. C. Dev. "Buddha, The Humanist". Paramount Publishers, Dhaka. 1969

৪৩ See. Hasan Azizul Huq (ed). "Works of Govinda Chandra Dev", Vol. II. 1978. p. 128

৪৪ পরিতাপের বিষয় এই নিবন্ধটির কোন পরিপূর্ণ সংরক্ষিত রূপ পাওয়া যায় নি। বাংলা একাডেমী প্রকাশিত তিনখণ্ডের রচনাবলীতেও এ-সম্পর্কে কোন তথ্য নেই।

৪৫ দ্র: "আজাদ"। ১৪ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৭-র সম্পাদকীয় মন্তব্য।